PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-13, No.-2, Nov 2022

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দলিত কথা

ড. সঞ্জয় পাল [1*]

[1*] সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:

'দলিত' শব্দের অর্থ দলন করা বা মাড়িয়ে যাওয়া। পৃথিবীর সব দেশেই দলন-পীড়ন রীতি পরিলক্ষিত হয়। ধনী কর্তৃক নির্ধন শোষণ যেন বর্তমান কালেও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বর্তমান প্রবন্ধে সেই বিষয়েই অবতারণা করা হবে।

বাংলাসাহিত্য সৃষ্টির মূলেই আছে দলিত বা অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ। চর্যাগীতি গুলিতে প্রাচীন কালের (বাংলার) নিম্নশ্রেণীর মানুষের পরিচয় চর্যাকারগণ সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করেছেন। কোন কোন পদকর্তা আবার নিজেও তথাকথিত নিম্ন বা অন্ত্যজশ্রেণীভুক্ত বলে পরিচয় পাওয়া যায়। আদিমধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মধ্যেও দলিত বা অন্ত্যজশ্রেণীর চরিত্রের সন্ধান মেলে। অনেক সমলোচকদের মতে কাব্যের মূল কৃষ্ণ ও রাধা চরিত্রও কাব্যেরশ্রেণীভুক্ত। চরিত্রের নানা কথোপকথনের মাধ্যমে এই পরিচয় ব্যক্ত হয়।

অন্ত্যমধ্যযুগের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও অন্ত্যজ বা নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের সন্ধান মেলে। এই কাব্যের দেবদেবীদের কেও খানিকটা আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণে সৃষ্টি করা হয়েছে। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যের মধ্যে এই সত্য পরিলক্ষিত হয়। স্বয়ং চৈতন্যদেবও নিম্নশ্রেণীর মানুষকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তার পরিচয় চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যের মধ্যে আমরা পেয়েছি। আধুনিককালে তো বহু লেখক এই তথাকথিত দলিত বা অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষকে নিয়ে লেখা হয়ে চলেছে এবং চলবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধে শুধুমাত্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে দলিত বা অন্ত্যজ চেতনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে।

সূচক শব্দ : দলিত-অন্ত্যজ বা নিম্নশ্রেণি, চতুরাশ্রম-হিন্দুধর্মের চারটি প্রথা, চণ্ডাল-নিষাদ জাতি, প্রতিলোম-প্রতিকূল, অশুচি-অপবিত্র।

'দলিত' শব্দের দ্বারা এমন কিছু জাতিগত গোষ্ঠী কে বোঝানো হয় যারা সচরাচর নিপীড়িত এবং অনগ্রসর জাতি রূপে চিহ্নিত। সংস্কৃত এবং হিন্দি ভাষায় দলিত শব্দের অর্থ হলো 'ভগ্ন' বা 'ছিন্নভিন্ন'। 'দলিতদের অনেকে হিন্দুধর্মের চতুরাশ্রম বর্ণব্যবস্থা থেকে আলাদা বলে এবং পঞ্চমবর্ণ হিসেবে দেখায়, যা পঞ্চমা নামেও পরিচিত।

জন্ম ও পেশাগত কারণে বৈষম্য এবং বঞ্চনার শিকার মানুষেরা আন্তর্জাতিক পরিসরে বিশেষ করে পণ্ডিতদের কাছে 'দলিত' নামে পরিচিত। 'দলিত' বলতে সমাজে যারা অস্পৃশ্য তাদের বোঝায়। যেমন- চর্মকার, মালাকার, কামার, কুমোর, জেলে, পাটনি, কৈবর্ত, কলু, কাহার, ক্ষৌরকার, নিকারি, রাজবংশী, শবর, কর্তাভজা, মালো, বাউলিয়া, এছাড়া প্রভূত সম্প্রদায় সমাজে অস্পৃশ্যতার শিকার। এইসব সম্প্রদায় আবার বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। ইসলামধর্ম জাতিভেদকে অস্বীকার করলেও এই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেকে পেশার কারণে সমাজে পদদলিত হয়ে রয়েছে, যেমন জোলা, হাজাম, বেদে, বাওয়ালি।

আবার 1838 থেকে 1850 এই সময় পর্বে বিভিন্ন সময়ে পূর্ববঙ্গে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকর্মী, চা-বাগানের শ্রমিক, জঙ্গলকাটা, পয়ঃনিষ্কাশন প্রভৃতি কাজের জন্য ভারতের উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, উড়িষ্যা, কুচবিহার,রাচি, মাদ্রাজ ও আসাম থেকে হিন্দি, উড়িষ্যা, দেশওয়ালি ও তেলেগু ভাষাভাষী মানুষের পূর্বপুরুষদের নিয়ে এসেছিল। অভাবি এই অধিবাসীরা দেশের সর্বত্র পরিচ্ছন্নতাকর্মী এবং সিলেটের চা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। ভূমিহীন ও নিজস্ব বসতভিটাহীন এসকল সম্প্রদায় বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে স্থানীয় সরকার

কর্তৃক প্রদত্ত জমি, রেলস্টেশন সহসরকারি খাসজমিতে বসবাস করছে।এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, হেলা, মুচি, ডোম, বাল্মিকী, রবিদাস, ডালু, মালা, চাকালি, নায়েক, বাউরি, শফোর, ভূঁইয়া প্রভৃত জনগোষ্ঠী। এসবজনগোষ্ঠী তেলেগু, ভোজপুরি, হিন্দি, সাচ্চারী ও দেশওয়ালি ভাষায় কথা বলে। এই সম্প্রদায়গুলিই মূলত অবাঙ্গালি দলিত শ্রেণি।

চতুরাশ্রম প্রথার শেষজাত চতুর্থ বর্ণ শূদ্র। ঋকবেদের বিরাট পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গজাত বর্ণগুলির মধ্যে শূদ্রতাঁরচরণ-দেশ থেকে শেষে জাত বলে ঘৃণ্য বা অবজ্ঞাত ছিল না। পরবর্তীতে শূদ্র থেকে জাত অর্থাৎ শূদ্রের ঔরসে উচ্চ বর্ণের স্ত্রীর গর্ভে 'প্রতিলোমজ' সন্তানদের 'অন্ত্যজ' বা 'চণ্ডাল' বলা হয়। শাস্ত্রসম্মত সবর্ণ এবং অসবর্ণ বিবাহের পর সামাজিক প্রথা লঙ্ঘন দ্বারা ভ্রষ্ট-সৎস্রবের সন্তানদের' অন্ত্যজ' বলা হয়েছে স্মৃতিশাস্ত্রে। এখন 'অন্ত' শব্দের অর্থ 'নীচ' বা 'হীন' বলে মনে করা হয় এবং নীচ কুলজাত অধমনীচাশয়-অস্পৃশ্য ব্যক্তি 'অন্ত্যজ' নামে পরিচিত হয়। তথাকথিত এই অন্ত্যজশ্রেণীই হল বর্তমানের দলিত সম্প্রদায়। সামাজিক ও আর্থিক দিক দিয়ে দলিত অবহেলিত, অস্পৃশ্য মানুষের কাহিনী বাংলাসাহিত্যের উন্মেষপর্ব থেকে বর্তমানেও বিভিন্ন লেখকদের লেখনীতে ধরা পড়েছে সেই বিষয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির এই ঊষালগ্ন অর্থাৎ চর্যাপদ রচিত হয়েছিল সমাজের দলিত, অস্পৃশ্য শ্রেণির মানুষদের নিয়ে। চর্যাপদগুলিতে মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিবর্তন ক্রমে জাত সহজিয়া বজ্রযানীদের গুহ্যায়িত দেহ-সাধনার কথা আছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ পদগুলিতে যেসব উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অলংকার প্রয়োগ করেছেন তার সবটাই লোকজীবন থেকে সংগৃহীত। লোকসমাজ জীবনের এইসব অলংকারের এর মধ্যদিয়ে সেকালের মানুষদের বিশেষত নিম্নশ্রেণির দলিত, অস্পৃশ্যদের জীবনচর্যা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আর এদেশে আর্য আগমনের পূর্বে কোল- অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ও মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠীর অনার্য জাতি বাস করত এবং তারমধ্যে কোলদের ছিল বেশি প্রাধান্য। সেই প্রাচীন কোলগণের মধ্যে শবর, শুণ্ডী, ডোম, চণ্ডাল, প্রভৃতি চর্যাগীতির যুগে সমাজের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করেছিল। চর্যাকারগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতি যে উচ্চ ছিল চর্যাগীতিতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এঁরা সাধনার সূক্ষতত্ত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে বারবার এই শবর-শুণ্ডী-ডোম- চণ্ডালদের কথা তাদের জীবনযাত্রা ও চরিত্রের কথা এজন্যই বেশি করে বিবৃত করেছেন। সেকালের সমাজব্যবস্থায় এই আদিম জাতিগুলি সভ্য নাগরিক জীবন থেকে দূরে অবস্থান করতো। চর্যাপদে দলিত নিম্নবর্গের মানুষেরা অস্পৃশ্য ছিল তার প্রমাণ দশম সংখ্যক গানে আছে–

"নগর বাহিরি রেঁ ডোম্বি তোহেরি কুড়িআ।
ছই ছোই জাই সো ব্রাহ্ম নাড়িআ।।

এই দলিত, অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য সমাজ শ্রমিকরা আর্থিক দিকে ছিল ভীষণভাবে দুস্থ। তাঁত বোনা, চাঙ্গাড়ী তৈরি ছাড়াও জাতীয় বৃত্তি ছিল নৌকা বাওয়া ও মাছ ধার। শবরপাদের ছাব্বিশ নম্বর গানে এই অন্ত্যজ শবর-শবরীদের পার্বত্য জীবনযাত্রার সুন্দর বর্ণনা আছে। পদকর্তা হয়তো নিজেও শবর ছিলেন বলে আমাদের অনুমান। তিনি বলেছেন-

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই শবরীবালী।
মোরঙ্গী পুচ্ছ পরহিন শবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।।

চর্যাপদ এর পর আদিম ধ্যযুগের বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যেও দলিত বা অন্ত্যজ শ্রেণীর কথা দেখতে পাওয়া যায়। বড়ুচণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে নতুন কাব্য রীতি প্রয়োগ করেন। যে কারণে এ কাব্য গোষ্ঠী-সংকীর্ণ তাকে ত্যাগ করে সর্বজনীন হয়ে ওঠে। লৌকিক আদর্শ অবলম্বন করে, পল্লীর অনাড়ম্বর পরিবেশকে তিনি ফুটিয়ে তোলেন। জনগণকে আনন্দদান করাই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের বিষয় বস্তু বিশ্লেষণ করলে আমরা বৈষ্ণব পদাবলীর কৃষ্ণের দেখা পায় না। নিম্নশ্রেণীর ব্রাত্য সমাজেরই এক কামার্ত যুবককেই এই আখ্যানের কামার্ত আখ্যানের নায়ক করা হয়েছে। এ কাব্যের প্রধান চরিত্র কৃষ্ণ তাই খাঁটি অর্থে পৌরাণিক চরিত্র নয়। নির্মম প্রতিহিংসা পরায়ণ ও উৎপীড়ক এই কৃষ্ণ পৌরাণিক

ভক্তবৎস লদেবতা নন। পুরাণের কৃষ্ণ ভক্তি স্বরূপিনী কৃষ্ণগতপ্রাণা 'হ্লাদিনী' নয় এ রাধা। ইনি বিবাহিতা কিন্তু নীতি বিবর্জিত প্রেমে-বিরোধিনী কৃষ্ণ দ্বোষিণী ও ধর্ষিতা এককন্যা। তাকে কোনোভাবেই লক্ষীর অবতার বলে মনে করা চলেনা। পৌরাণিক রাসলীলাই প্রেমিক-প্রেমিকার মুখ্য বিষয় যে মিলন, তা এখানে প্রেমহীন নিষ্ঠুর বলাৎকার মাত্র। শুধু তাই নয় এখানে দেবর্ষি নারদের যে দুর্গতি দেখানো হয়েছে তা রসিকতায় চূড়ান্ত। এ কাব্যের কাহিনীর নায়ক-নায়িকাকে বাহ্যত গোপজাতির অন্তর্গত করা হলেও তাঁরা কিন্তু ঠিক গোপজাতি ভুক্ত বলে মনে হয় না। সমাজের আরও নিম্নস্তরের অন্ত্যজ দুই নরনারী বলে আমাদের মনে হয়। এ কৃষ্ণরাধাকে 'ছিনারি' বলে সম্বোধন করেছেন (ছিনারি পামরী নাগরী রাধাকে পাতসিমায়া) কিংবা (নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী)। এমনকি তাকে মেরে যমঘরেও পাঠাতে চান কৃষ্ণ- " তবে ত্যজিমারিআঁ পাঠাওঁ যমঘর"। রাধাও কম কিসে। তিনি বলেন-"মাগু কিলে কিলাইয়া মারিব তোহ্মা বাটে"। নিম্ন বা অন্ত্যজ শ্রেণির ভাষা এ কাব্যে ব্যবহার করা হয়েছে। দানখণ্ডে রাধাশ্রীকৃষ্ণকে চণ্ডাল কৃষ্ণ বলেছেন। ভাগ্নে হয়ে তাঁর এই ধরনের আচরণ নিরক্ষর রুচিহীন তথাকথিত নিম্নশ্রেণির সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করে। বড়ুচণ্ডীদাসের কাব্যে তেলী, যূগী, বাঁধের মতো আরো দলিত বা অন্ত্যজ বর্ণের কথা বলা আছে। নীচে দৃষ্টান্তগুলো থেকে তখনকার দিনের লৌকিক-সংস্কার ও ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে জানা যায়। যেমন–

"কান্ধে কুরুআ দে আ তেলী আগে জাএ।"
দানখণ্ডে–
"ঘরের বাইরে হৈতেঁ তেলিনী তেল বিচিতেঁ
কাল কাক রএসুখাএ গাছের ডালে
আগে সুনা ঘটে নারী হাঁচী জিটিয়ে না বারী
চলিলোঁ তাহার উচিত পাঁও ফলে।"

চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ছাড়াও মধ্যযুগের বিরাট ব্যাপ্তির মধ্যে খুঁজলে দলিত নর-নারীর সন্ধান মিলবে। মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, লোককথা ও গীতিকা, বৈষ্ণবসাহিত্য, মুসলমানি সাহিত্যে বহু এ ধরনের চরিত্রে সন্ধান পাওয়া যাবে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বহু মিশ্র জাতি সম্বন্ধে সমালোচক বলেছেন-

"রামায়ণ কেবল নরচন্দ্রমা রামাদির কাহিনী নয়, অনভিজাত বহু হেয়জাতি ও অনার্য গোষ্ঠীর কথাও এই মহাকাব্যের আছে। রামভক্ত চণ্ডাল নিষাদরাজ গুহকের সঙ্গে তাই রামের মৈত্রীবন্ধন এবং সীতা উদ্ধারের বনবাসী অনার্য-কৌমান্তর্গত নানা গোষ্ঠীর বানরদের সাথেও সখ্য স্থাপনও তাদের সাহায্য গ্রহণ।" [১]

মহাভারতে দাস দুহিতা মৎস্যগন্ধা সত্যবতী পরাশর মুনির বরে, শুধু পদ্মগন্ধা হননি, তাঁর গর্ভেই চন্দ্র বংশের পরবর্তী রাজাদের জন্ম। আর এর জন্য মুনিকে তুষ্ট করতে ব্যাসদেবকে জন্ম দিতে হয়েছিল তাকে কুমারী অবস্থায়। যদিও মুনির ভয় ছিল–

"অনূঢ়া আছহ তুমি প্রথম যৌবনে
যদি এই রূপে থাক আমার বচনে।।
বলিলা, তোমার জন্ম কৈবর্তের ঘরে।
মহারাজ বিবাহ করিবে মোর বরে।।" [২]

'শিবায়নকাব্যে' শিবের কৃষকরূপ এবং দুর্গার বাগদিনী রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে–

"আর্যেতর অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত আদি বঙ্গবাসীদের সমাজ যখন মূলতঃ কৃষিনির্ভর ছিল, তখন সেই দূরাস্তৃত অতীতের কৃষক সমাজ যে ধরনের কৃষি দেবতার পরিকল্পনা হয়েছিল। বহু শতাব্দী পরেও তার ক্ষীণ ধ্বংসাবশেষ এ দেশে বজায় ছিল। পরবর্তীকালে পৌরাণিক শিব ও আদিম কৃষি সংস্কৃতির কোনও অমার্জিত স্থূল দেবতাকে সংমিশ্রিত করে শিবায়ন কাহিনীগুলি গড়ে উঠেছিল।" [৩]

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা ও অনার্য ভাবনার মিশ্রণে গঠিত হয়েছিল। দেবতা হিসেবে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হলেও অন্ত্যজ মানুষের দ্বারা পূজিত হলেও, ভদ্র সমাজে তাদের প্রতিপত্তি নেই বলে স্বর্গে তাঁদের ঠাই নেই। সমগ্র মঙ্গলকাব্যের মধ্যে এই ধরনের সংগ্রাম লক্ষ্য করা গেছে। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে ডোম নারীর ছদ্মবেশে শিবকে ছলনা করার পর চন্ডী বলেছে–

"খাইলা ডোমের অন্ন, তোরে ছোঁবে কে।..."

দেবী মনসা তাঁর সহচরী অন্ত্যজ, দলিত সমাজের ধোপানি নেতার সাহায্যে প্রথমে অন্ত্যজ সমাজে পূজা প্রচার করেছেন। চাষী, তাঁতী, জেলে, রাখাল ,মাঝি-মাল্লা-এই অন্ত্যজ শ্রেণীর সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর বিত্তশালী বা প্রভাব-প্রতিপত্তি জন সমাজের কথা ভেবেছে।

কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তীর আখেটিক খণ্ডে দেখতে পাওয়া যায় অন্ত্যজ, দলিত নায়ক-নায়িকা কালকেতু ও ফুল্লরাকে কবি ব্যাধ জীবনের পরিবেশে তাঁর নায়ক চরিত্রের মধ্যে একাধারে দ্বৈত ভূমিকা রূপায়ণে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। এখানে দেবীচণ্ডীর স্বর্গে উত্তোলনের মতো, তাঁর বরপুত্র কালকেতুরও অন্ত্যজ ব্যাধ জীবন থেকে মুক্তি ঘটেছে। সমাজ তাকে কিভাবে গ্রহণ করবে, আত্মসচেতন কালকে তো নিজেই সে প্রশ্ন তুলেছে। দেবীর কৃপায় ব্যাধ কালকেতু যেমন রাতারাতি বড়লোক হয়েছে, ঠিক তেমনি জাত-পাতের বাঁধা ও দূরীভূত হয়েছে দেবীর কৃপায়। দেবী তাকে বলেছেন–

"অম্বিকা বলেন কিছু ব্যাধের নন্দনে।
পবিত্র হইলে মোর পদ দরশনে।।
লইবে তোমার ধন উত্তম ব্রাহ্মণ।
এতেক বলিয়া চণ্ডী করিলা গমন।।

ধর্মমঙ্গলকাব্যে ধর্ম ঠাকুরের পূজার প্রধান পুরোহিত হিসেবে প্রচলিত আছে রামাই পণ্ডিতের নাম। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত একটি কাহিনী থেকে জানা যায় তিনি তাঁর নিজ পুত্রকে অভিশাপ দিয়েছিলেন–'হইবি ডোমের পুরোহিত' "এ কাহিনী থেকে দেখা যাচ্ছে রামাইয়ের পুত্র থেকেই ধর্মপূজকগণ ডোমের পুরোহিত হয়ে গিয়েছিলেন"[৪]

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তখন অভিশাপ মানেই নিম্নকুলে জন্ম গ্রহণ। আর এই সূত্র ধরেই বোধহয় ধর্মঠাকুরের পূজকের উৎপত্তি হয়েছে।

> "যাহারা ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাধারণত তারা সাধারণত ব্রাক্ষণ নহেন, ডোম জাতিভুক্ত লোকই প্রধানত এই দেবতার পূজারি হইয়া থাকেন। পূজারীদিগের উপাধি পণ্ডিত, তাঁহারা দেয়াসী বা দেবাংশী বলিয়াও পরিচিত। .... যে গ্রামে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সেখানে বাৎসরিক পূজানুষ্ঠানের সময় বর্তমান ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি দেয়াসীরাও দেবতার উপর নিজেদের কর্তৃত্ব ত্যাগ করেন না। দেবতার নামে তুকতাক, ওষুধ ও মাদুলী দেয়াসীই দিয়া থাকেন, একমাত্র পূজা করা ব্যতীত ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দেবতার উপর আর কোনও অধিকার নাই। দেয়াসী সাধারণত দেবতার বাৎসরিক সেবক ও তত্ত্বাবধায়ক রূপেই কার্য করিয়া থাকেন। ডোম ব্যতীত ও বর্তমানে কোনও কোনও জায়গায় অন্যান্য অস্পৃশ্য শ্রেণীর লোক ও ধর্মঠাকুরের দেয়াসী হইয়া থাকেন। কিন্ত ডোম পণ্ডিতদিগের এই কার্যে বিশেষ অধিকার আছে বলিয়া মনে করা হয়। মানভূম জেলায় একটি প্রচলিত কথা আছে, 'আর কোথাও জায়গা পেলে না, শেষে ডোমের বাড়িতে উঠলে গিয়ে ধর্মরাজঠাকুর। ব্রাহ্মণগণ যে যেমন উপবীত ধারণ করেন, তেমনি ধর্মরাজঠাকুরের ডোম পূজারীগণ তাম্র ধারণ করেন। তাম্র ধারণ অর্থ, বাহুতে তামার তাগা ও হাতে আংটি ধারণ করা। তাম্র ধারণ না করিলে কেহই ধর্মঠাকুরের পুরোহিত হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের তাম্র দীক্ষার প্রয়োজন হয় না।" [৫]

মধ্যযুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। বাংলাদেশে তুর্কি আক্রমণের প্রত্যক্ষ প্রভাবে একটা বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক ভাঙ্গনরোধ করতে আর্য-অনার্য মিলন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই সাংস্কৃতিক মিলনই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব ধর্মসমন্বয়ী মানবতার মন্ত্র ,সকল মানুষকে একই বাতাবরণে ঢাকার চেষ্টা করেছিল। যাঁর পদ যুগলের আশায় 'সুরাসুর' সকলেই ধেয়ে আসে, সেখানে উচ্চ-নীচ, স্ত্রী-পুরুষ, জাত –বেজাত কোন কিছুর ভেদাভেদ ছিলনা। অন্ত্যজ বা দলিত মানুষের কাছে এক পরম পাওনা। কৃষ্ণনাম শ্রবণে চণ্ডাল আর চণ্ডাল থাকে না, অশুচিও পবিত্র হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে একটি মহৎ প্রণিধানযোগ্য–

> "বাংলাদেশে পাল যুগ হইতে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর শ্রেণী সম্প্রদায়ের যে বিন্যাসরীতি অনুসৃত হইয়াছিল, স্মৃতি সংহিতা যাহাকে গঠন ও পোষণ করিয়াছে, চৈতন্যযুগে আসিয়া তাহাতে বিশেষ পরিবর্তনের সূচনা হইল। বৈষ্ণব গোস্বামীগণ নূতন করিয়া বৈষ্ণব স্মৃতি রচনায় প্রস্তুত হইলে সমাজে ব্রাহ্মণ- অব্রাহ্মণ সংস্কারের প্রাচীরে ফাটল ধরিল। একদিকে যেমন সমাজের অভ্যন্তরে এইরূপ একটা পরিবর্তনের ধারা ছুটিয়া আসিল তেমনি পরিব্রাজক চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাঙালির ভৌগলিক সংকীর্ণতা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইল।"[৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্যেও দেখা যায় দেবী সমাজের লাঞ্ছিত, অবহেলিত, দলিত মানুষের দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করছেন তার অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে।

পরিশেষে বলা যায় ‘দলিত’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল দলন করা। ধনী কর্তৃক নির্ধন পৃথিবীর সবদেশে ইশোষিত হয়। প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র সবসময়ই পক্ষগ্রহণ করে। শুধুমাত্র শোষকের রুপের পরিবর্তন ঘটে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দলিত কথাতে আমরা দেখিয়েছি যে কিভাবে উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণ তথা নিম্নবৃত্তের মানুষের উপর অত্যাচার করেছে। চর্যাপদে নেড়ে ব্রাহ্মণেরা অন্ত্যজ দলিত মহিলাদের উপর অত্যাচার করেছে। মধ্যযুগের সামন্ত প্রভুরা তাঁদের প্রজাদিগকে নানাভাবে অত্যাচার করেছে। অত্যাচারে, অত্যাচারে জর্জরিত দলিত সম্প্রদায় তখন কিন্তু কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। কারণ ও প্রতিরোধের ক্ষেত্র সে সময় প্রস্তুত ছিল না। বর্তমানকালে দলিতরা তাঁদের ন্যায্য পাওনার দাবিতে নানা গণসংগ্রাম করে তুলছে। এ প্রবন্ধে সেবিষয়ে আলোচনার অবকাশ নেই। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে অন কোথাও আলোচনা করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায় পরিতোষ, বাংলা সাহিত্যের অনগ্রসর শ্রেণী (সূচনা থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী) ১ম খণ্ড, এপ্রিল ১৯৯৭, পৃ. ১৪২
২. দাস কাশীরাম, মহাভারত, আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, ৩য় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৫
৩. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সি, ৫ম সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ১৯২
৪. তদেব, ৭ম সংস্করণ, পৃ. ১৫০
৫. ভট্টাচার্য্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ১০ম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০২, পৃ. ৬২৭-৬২৮
৬. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সি, ৫ম সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ১৯২

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১-৩য় খণ্ড), সুকুমার সেন।
২. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, ক্ষেত্র গুপ্ত।
৩. চর্যাগীতি পরিক্রমা, নির্মল দাশ।
৪. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য।
৫. মহাভারত, কাশীরাম দাস।
৬. দলিত সমাজ ও আম্বেদকর, অতীন ঘোষ।
৭. নিম্নবর্গের ইতিহাস, পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম ভদ্র সম্পাদিত।
৮. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯. দলিত সাহিত্য, নীতিশ বিশ্বাস সম্পাদিত।
১০. বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, বিনয় ঘোষ।
১১. নির্বাচিত সাহিত্য প্রবন্ধ,সঞ্জয় পাল।